Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501071 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Narratives by the Bards of Rarh Bengal: In the context of Devotee and God

রাঢ়ের কবিগানের পালা: প্রসঙ্গ ভক্ত ও ভগবান

Manik Ghosh (Kabiyal)
Researcher
Bengali Department
Vidyasagar University

Received on: 19th May 2026
Accepted on: 29th May 2026

Abstract:

Kobigaan is a performing art. It is basically aural literature. It is a conflictual and controversial folk song. Therefore, two groups are required in this song. The main singer of Kobigaan is called 'kobiyal' or 'Kabisarkar' or 'Chharadar' or 'Chharakar'. Since it is an argumentative and quarrelsome song, this song is still called 'Kabir-Lorai' in rural areas. 'Dhol'(Drum) is the main musical instrument of Kobigaan. Kobiyals present all their arguments in the form of rhymes and Panchali to the beat of the drum. A main topic is needed for performing Kobigaan. The cold war between the two groups is centred around this topic. There is no bloodshed in this fight. There is only neat logic in this fight. The entire stage and the audience seating area is a court or courtroom. The two kobiyals are the lawyers of the two sides. One is the lawyer of the plaintiff and the other is the lawyer of the defendant. And the audience or listeners are the judges. After listening to the arguments of the lawyer of both sides, they give their opinion on which side has own. The subject on which the kobiyals argue is called 'Kobir Pala' or 'Pala' in the 'Kobiyali language.' Some of the topics or subjects of Kobigaan are mythological, some topics are social, some topics are political and some topics are historical etc. Some of the notable topics in Kobigaan of Rarbanga are Ram-Ravan, Krishna-Gandhari, Krishna-Duroyodhana, Karna-Arjun, Dharma-adharma, Nari-Purush, Sekal-ekal, Karma-bhagya, Bhagaban-Bigyan, Shiva-Durga, Guru-Shishya, Bhakta-Bhagaban etc. Among these topics, Bhakta-Bhagaban topic the topic of pure devotion. The rendition of the kobiyals awakens devotions in the audience even for a moment and a flood of devotion flows. The kobiyals have the responsibility of pulling the restless minds of people to the path of religion; this is the professional skill of the kobiyals.

Key Words:

Aural literature, Conflictual folk song, Cold war, Kobir-lorai, Kobiyali language, Kobir pala, Pure devotion, Flood of devotion

মূল প্রবন্ধ

কবিগান একটি 'শ্রুতিকাব্য' বা 'শ্রুতিসাহিত্য'। মঞ্চে দর্শকাসনে বসে কবিগানের উত্তাপ বা আমেজ উপলব্ধি করতে হয়। কবিগান করতে গেলে দুটি দলের প্রয়োজন। দুটি দল ছাড়া কবিগান করা কখনোই সম্ভব নয়। কবিগান একটি দ্বন্দ্বমূলক বা বিতর্কমূলক গান। যাঁরা দুটি দলের প্রধান গায়ক তাঁদের 'কবিয়াল' বা 'কবিসরকার' বলা হয়। তবে এঁদের 'কবিওয়ালা'ও বলা হতো এক সময়। "'কবি'

© Santiniketan Sahityapath

শব্দটির সঙ্গে বৃত্তিবাচক 'ওয়ালা' প্রত্যয় যোগ করে 'কবিওয়ালা' শব্দের উৎপত্তি। যাঁরা কবিতাকে জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁরাই কবিওয়ালা।"[১] কবিগানে পাঁচালি, ছড়া প্রয়োগ করে ঢোলের তালে তালে মঞ্চে পরিবেশন করতে হয়। তাই কবিয়ালদের 'ছড়াকার' বা 'ছড়াদার'ও বলা হয়ে থাকে। তবে কবিয়ালরা নিজেদের বর্তমানে 'চারণকবি' পরিচয় দিতে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করেন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লোকপ্রসার প্রকল্পে' পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালদের যে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে সেখানে কবিয়ালদের 'চারণকবি' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। কবির দলে যাঁরা ঢোল বাজিয়ে থাকেন তাঁদের ঢুলিদার, ঢুলি বা বায়েন বলা হয়ে থাকে। একজন কবিয়ালের যশ, খ্যাতির পিছনে ঢুলিদারের ভূমিকা থাকে অনেকখানি। ঢুলিদারের বাজনা বা শরীরী ভাষা অনেক সময় বিপক্ষ দলকে ব্যাক ফুটে ফেলে দেয়। কবির দলে যারা কবিয়ালের গাওয়া গানের স্থায়ী অংশকে দুই বার বা তিনবার গেয়ে থাকেন তাঁদের 'দোহার' বা 'দোহারি' বলা হয়। একটি কবির দলে সাধারণত দুইজন বা তিনজন দোহার থাকে। একজন দোহার করতাল বা খঞ্জনি বাজান অন্যজন দোহার হারমোনিয়াম, ক্যাসিও বা সিন্থেসাইজার বাজিয়ে গানের সুর বা রেশকে ধরে রাখেন। তবে নদিয়া, চব্বিশ পরগনার যে সব কবিয়াল পূর্ববঙ্গীয় ঘরানায় কবিগান পরিবেশন করে থাকেন তাঁদের দলে দুজনের বেশি দোহার থাকে। তাঁদের মধ্যে কেউ ফ্লুটবাঁশি, আড়বাঁশি, বেহালা ইত্যাদি বাজিয়ে সঙ্গত করেন। তবে রাঢ়ের কবিগানে সাধারণত দুইজন দোহারের উপস্থিতিই বেশি চোখে পড়ে। একজন কবিয়ালের রেখে যাওয়া প্রশ্নগুলিকে অন্যপক্ষের কবিয়াল উত্তর দেবার চেষ্টা করেন এবং তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু যুক্তিজাল রচনা করেন পুনরায় বিপক্ষ কবিয়ালকে কিছু প্রশ্ন রেখে মঞ্চ থেকে নেমে যান। এভাবেই কবিগানের পরিধির বিস্তার ঘটে। কবিগান একটি বাগবিতণ্ডামূলক বা ঝগড়াটে গান তাই গ্রামেগঞ্জে আজও কবিগানকে 'কবির-লড়াই' বলা হয়। তবে কবিগানের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া বেশ কঠিন। সজনীকান্ত দাস কবিগানের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন — "কবিগানের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তা পাঁচালী, আখড়াই, হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্ক গীত প্রভৃতি নানা বিচিত্র বস্তুর সংমিশ্রণে কবিগান জন্মলাভ করে।"[২] কবিগানের আদিগুরু কে? সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে আজ পর্যন্ত কবিগানের যত গবেষণা হয়েছে তাতে প্রত্যেককেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন এবং গোঁজলা গুঁইকেই কবিগানের আদিগুরু বলে এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবিয়ালদের মুখের একটি ছড়া উল্লেখযোগ্য —

গোঁজলা গুঁই নামে একজন কবিওয়ালা ছিল।
সেই তো প্রথম কবিগানের দল করে গেল।।

কোন পূন্যলগ্নে ঠিক কোন কোন গানের সংমিশ্রণে কবিগানের জন্ম হয়েছে তা বলা বেশ কষ্টকর। তবে কবিগান যে বেশ প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে কবিগুরুর একটি কবিতার লাইনকে রকমফের করে বলা যায়:

"হায়রে কবে কেটে গেছে কবিগানের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।।"[৩]

তবে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কে কবিগানের সুবর্ণযুগ বলা হয়, "The existence of Kobi songs may be traced to the beginning of the 18th century or even beyond it to the 17th, but the most flourishing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1830."[৪]

প্রাচীন রীতির কবিগানে ১। মালসী ২। গৌরচন্দ্রী ৩। সখীসংবাদ, ৪। গোষ্ঠ ৫। খেউড় বা কবি ৫ এই পঞ্চাঙ্গ বিভাগ ছিল। কিন্তু বিবর্তনের ধারা বেয়ে বর্তমানে কবিগানের পঞ্চাঙ্গ রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে কবিগানের পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় অঙ্গ হলো 'কবিগানের পালা' বা 'চাপান-উতোর পর্ব'। এই চাপান-উতর পর্বটিকেই কবিগানের মূল অংশ বা কবিগানের প্রাণ বলা হয়। যে বিষয়টিকে ভিত্তি করে দুটি কবিয়ালের মধ্যে বিতর্ক হয় সেই বিষয়টিকে 'কবিগানের পালা' বলা হয়। কবিগানে অনেক

পালা আছে। তাদের মধ্যে কিছু পুরাণাশ্রয়ী ও কিছু সামাজিক পালা, কিছু রাজনৈতিক পালা, কিছু ঐতিহাসিক পালা ইত্যাদি। এইসব পালাগুলিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

রামায়ণ কেন্দ্রিক কবিগানের পালা: রাম -রাবণ, লক্ষণ-ইন্দ্রজিৎ হনুমান-রাবণ ইত্যাদি।

মহাভারত কেন্দ্রিক কবিগানের পালা: কৃষ্ণ-গান্ধারী, কৃষ্ণ-দুর্যোধন, কর্ণ-অর্জুন, অর্জুন-বভ্রুবাহন, পরশুরাম-ভীষ্ম ইত্যাদি।

সামাজিক পালা: দাদু-নাতি, পুরুষ-নারী, পণ্ডিত-মূর্খ, গ্রাম-শহর, দুধ-মদ, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি।

রাজনৈতিক পালা: বামফ্রন্ট-যুক্তফ্রন্ট, আমেরিকা-ভারত ইত্যাদি।

কবিগানে বহুল আলোচিত কিছু পালা হলো রাম-রাবণ, লক্ষণ-ইন্দ্রজিৎ, কৃষ্ণ-গান্ধারী, কৃষ্ণ-দুর্যোধন, ধর্ম-অধর্ম, শিব-দুর্গা, নারী-পুরুষ, সেকালে-একাল, শাক্ত-বৈষ্ণব, দাদু-নাতি, গুরু-শিষ্য, ভক্ত-ভগবান, ইত্যাদি। এই পালাগানগুলির মধ্যে ভক্ত-ভগবান পালাটি অন্যতম ভক্তিমার্গের পালা। এই পালাটি নির্দিষ্ট কোনো পুরাণকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয় না। বিভিন্ন পুরাণ থেকে রেফারেন্স লাগে এই পালাগানটিকে পরিবেশন করার জন্য। ভক্ত-ভগবান পালাগানটিকে যে-কোনো একটি ভূমিকা থেকে শুরু করতে পারেন কবিয়ালরা। কারণ যিনি মঞ্চে প্রথম উঠেন তিনি জানেন না যে কোন পালাগানকে কেন্দ্র করে কবিগান অনুষ্ঠিত হবে। পালাগান নির্ধারিত হয় তাৎক্ষণিকভাবে দর্শক বা শ্রোতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বা চাহিদা অনুযায়ী। যদি পালাটি নির্ধারিত হয়েও যায় যে 'ভক্ত-ভগবান' পালায় গান হবে তখনো কবিয়াল জানেন না যে তাঁকে কোন ভূমিকায় গান করতে হবে। তাই যে-কোনো ভূমিকায় গান গাইবার জন্য কবিয়ালদের প্রস্তুত থাকতে হয়। এজন্যই তাঁদের পুরাণ, পুঁথি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হয়। মঞ্চে দণ্ডায়মান কবিয়ালকে যে-কোনো একটি পালায় অভিনয় করতে হতে পারে। এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য ধরে নিলাম প্রথম আসর নেওয়া কবিয়ালকে ভক্তের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য শ্রোতাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হলো। সেক্ষেত্রে তিনি পালাটিকে এভাবে শুরু করতে পারেন —

ভক্তের ভূমিকাধারী কবিয়াল প্রথমে মাইকা পাঁচালি, বন্দনা গান, ইত্যাদি পরিবেশন করার পর কিছু কথা বলে ভক্তের প্রকারভেদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন,

চার প্রকার ভক্ত মোরা শাস্ত্র মধ্যে পাই।
এক এক করে দিয়ে যাব তাহার পরিচয়।।
আর্ত ভক্ত, অর্থার্থী ভক্ত দুই ভক্ত হল।
জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভক্ত ওগো শ্রোতাদল।।
আমি জিজ্ঞাসু স্বভাবের ভক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে যাই।
তুমি যথাযথ উত্তর দিও ভগবান আমায়।।

এভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে আর্ত স্বভাবের ভক্ত হলো দ্রৌপদী যিনি বিপদে পড়ে ভগবানকে ডেকেছিলেন। অর্থার্থী স্বভাবের ভক্ত হলেন অম্বা; যিনি পার্থিব জিনিস লাভের আশায় অর্থাৎ স্বামী লাভের আশায় ভগবানকে স্মরণ করেছিলেন। জিজ্ঞাসু স্বভাবের ভক্ত হলেন অর্জুন যিনি তাঁর সৃষ্টি ও স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য কৌতূহলী হয়ে আরাধনা করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে গীতার জ্ঞান পেয়েছিলেন। জ্ঞানী স্বভাবের ভক্ত হলেন ভক্ত প্রহ্লাদ যিনি জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরকে পরম জ্ঞানে আরাধনা করেন। আজকে তিনি (ভক্তের ভূমিকাধারী কবিয়াল) জিজ্ঞাসু স্বভাবের ভক্ত হয়ে ভগবানের কাছ থেকে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চান। এই বলে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করে থাকেন ভগবানের ভূমিকায় থাকা কবিয়ালকে।

— ভগবান কাকে বলে?

— ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যের নাম কী?

— ভক্তের জন্যই ভগবানের প্রকাশ। তাহলে ভগবান ভক্তের জন্য কী করেছেন?

© Santiniketan Sahityapath

এমনই কিছু প্রশ্ন দিয়ে ভক্তের ভূমিকাধারী কবিয়াল মঞ্চ ছেড়ে নেমে যান। তারপর ভগবানের ভূমিকাধারী কবিয়াল মঞ্চে উঠে পাঁচালি, বন্দনা ইত্যাদি গাইবার পরে তিনি ভক্তের ভূমিকাধারী কবিয়ালের রেখে যাওয়া প্রশ্নগুলিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তারপর তিনিও ভক্তের ভূমিকাধারী কবিয়ালকে কিছু প্রশ্ন রেখে মঞ্চ ছাড়েন। এভাবেই কবিগান এগোতে থাকে। এটাই কবিগানের স্বাভাবিক রীতি।

প্রথমে ভগবানের ভূমিকাধারী কবিয়াল মঞ্চে উঠে কিছু কথা বলেন। ভগবান হওয়ার কোনো ক্ষমতা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি কেবলমাত্র দর্শকদের আদেশকে শিরোধার্য করে নিয়ে তিন থেকে চার ঘণ্টার জন্য ভগবানের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এই বলে শুরু করেন —

আমার বিপক্ষে পাল্লাদার পালা ধরে গেল।
আপনাদের কথামতো নিজে ভক্ত সাজিল।।
আপনাদের কথামতো আমায় ভগবান সাজায়।
কিন্তু ভগবানের কোন গুণ আমার মধ্যে নাই।।
দশজনের চরণধুলি তুলে নিলাম শিরে।
দয়া করে ভগবান এসো এই আসরে।।
দশজনে হৃদয় থেকে কৃপা করেন যদি।
অবশ্যই আসবে নেমে আমার দয়াল গুণনিধি।।

এইভাবে তিনি পালাটিকে শুরু করে তারপর প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। ভগবান কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে ভগবান কোনো পুরুষ মানুষও নন আবার কোনো স্ত্রীলোকও নন। 'ভগ' শব্দের অর্থ হলো ভগদেহ যেটি নারীর যৌনাঙ্গকে বোঝায় অর্থাৎ ভগ হলো নারী শক্তি। 'বান' হলো বানশক্তি যেটি পুরুষের যৌনাঙ্গকে বোঝায়। অর্থাৎ বান হলো পুরুষশক্তি। তাই নারী শক্তি ও পুরুষ শক্তি একত্রিত হয়ে ভগবান। এখানে কবিয়ালরা কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি রাধারানী এবং পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি দুই-এ মিলে একত্রিত হয়ে ভগবানের রূপ নেয় এমন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন আবার শিবশক্তি এবং দুর্গাশক্তি একত্রিত হয়ে ভগবানের রূপ নেয়। এমন তত্ত্ব বা তথ্য পুরাণে আছে কিনা জানা নেই কিন্তু গুরু-শিষ্য পরম্পরায় কবিয়ালরা এমনি কিছু লৌকিক কথাকে পুরাণের সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে দর্শকদের সামনে পরিবেশন করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে কবিয়ালদের মুখে একটি শ্লোক শুনতে পাওয়া যায়। যথা:

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবাননিতি।।

অর্থাৎ ভূত সকলের সৃষ্টি ও বিনাশ আগমন গমন এবং বিদ্যা অবিদ্যাকে যিনি জানেন তিনি ভগবান। আবার কোনো কোনো কবিয়াল ভগবান শব্দটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন —

ভ — শব্দে 'ভূমি', মাটি যারে কয়।
গ — শব্দে 'গগন', দিয়ে যাই পরিচয়।।
ব — শব্দে বাতাস শোনো দিয়া মন।
আ — শব্দে 'আকাশ' দিচ্ছি বিবরণ।।
ন — শব্দে 'নীর' যাকে জল বলে জানি।
শোনো ভক্ত ভগবানের জানালাম কাহিনী।।
অপ, ক্ষিতি, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পঞ্চভূত হল।
ভগবানের মধ্যে আছে সে সকল।।

© Santiniketan Sahityapath

পঞ্চভূতে গড়া দেহ শাস্ত্রের বর্ণনা।
ওই মানবদেহেই ভগবান থাকে কান করে শোনোনা।।
নিজে যদি নিজেকে চিনতে পারো তুমি।
ভগবান মিলবে সেদিন ভক্ত গুণমনি।।

ভগবান হলেন ছয়টি দিব্যগুণ বা ষড়ৈশ্বর্যের মালিক। সেই ষড়ৈশ্বর্য হলো: ঐশ্বর্য অর্থাৎ ধনসম্পত্তি। ভগবান অসীম ঐশ্বর্য ও সমস্ত সম্পদের মালিক। বীর্য অর্থাৎ শক্তিমান বা ক্ষমতাবান। ভগবান অসীম পরাক্রম ও সমস্ত শক্তির উৎস। যশ অর্থাৎ খ্যাতি। সমগ্র বিশ্বে তাঁর অসীম পরিচিতি এবং অদ্বিতীয় সুখ্যাতি। শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য। ভগবান সমস্ত ঐশ্বরিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আধার। জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানী। ভগবান অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্বব্যাপী ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী। বৈরাগ্য অর্থাৎ ত্যাগ। ভগবান সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেও সবকিছুর প্রতি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বা অনাসক্ত থাকেন,

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতিরণা।

ভক্তের জন্যই ভগবান প্রকট হন। তাহলে ভগবান ভক্তের জন্য কী করেছেন এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবানের ভূমিকাধারি কবিয়াল বলেন ভগবান বারবার ভক্ত প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। সবশেষে নৃসিংহ রূপ ধরে ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছেন এবং হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছেন। ভক্তের সম্মান রক্ষার জন্যই আজও বীরভূমের তারাপীঠে মা তারাকে অন্নভোগ নিবেদন করার পূর্বে ভক্ত বামাক্ষ্যাপাকে আগে ভোগ নিবেদন করা হয়। ভক্তের মান রক্ষার জন্যই বর্ধমানের অগ্রদ্বীপে গোবিন্দ ঘোষের সন্তান মারা যাওয়ার পর যখন ভক্ত গোবিন্দ ঘোষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন যে তার পারলৌকিক ক্রিয়া করার মতো আর কেউ নেই। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ঘোষকে কথা দেন যে তিনি স্বয়ং গোবিন্দ ঘোষের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। তাই গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পর কোনো একটি অচেনা কৃষ্ণবর্ণ বালক সাদা থান ও উত্তরীয় পরে গোবিন্দ ঘোষের মুখাগ্নি করেছিলেন এবং তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। সেই থেকে আজও অগ্রদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের যে বিগ্রহ সেই বিগ্রহ উত্তরীয় গলায় বিরাজমান। এ সমস্ত কিছুই ভগবান ভক্তের জন্যই করেছেন। কারণ,

ভক্ত আমার মাতা পিতা ভক্ত আমার গুরু।
ভক্ত আমার নাম রেখেছে বাঞ্ছাকল্পতরু।।

এভাবেই ভগবানের ভুমিকাধারী কবিয়াল একে একে বিভিন্ন পুরাণ কথা ও লোককথা থেকে বিভিন্ন উদাহরণ শ্রোতাদের সামনে পরিবেশন করে থাকেন। ফলে পুরো মঞ্চটি ভক্তিরসে প্লাবিত হয়ে যায়। তারপর ভগবানের ভূমিকাধারী কবিয়াল দু-একটি প্রশ্ন ভক্তের ভূমিকাধারী কবিয়ালের কাছে রেখে যান। যথা — হে ভক্ত, এই বিশ্বে ফুল, ফল, মাটি, আকাশ, বাতাস, গাছপালা সবই তো ভগবানের দান। তুমি দেবতা বা ভগবানের উদ্দেশ্যে যে বেলপাতা, ফুল, ফল, জল ইত্যাদি অর্পণ করো সেগুলি সবই ভগবানের দান। তাহলে ভগবানকে দেবার মতো তোমার নিজস্ব জিনিস কী আছে?

এটা জানতে আমার হয় বাসনা।
তুমি করে যাবে আলোচনা।।
—ভক্ত বড়ো শক্ত কথা গুরু রইল বসে।
গাছের ফল রইল গাছে বোঁটা পড়বে খসে।।

এই কথাটির তাৎপর্য কী তুমি বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। এরকম দু একটি প্রশ্ন দিয়ে ভগবানের ভূমিকাধারী কবিয়াল বসে পড়েন।

তারপর ভক্তের ভূমিকাধারী কবিয়াল মঞ্চে উঠে কবিয়ালি গল্প, ঢেসের ছড়া, টপ্পাগান গেয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ভগবানকে দেবার মতো ভক্তের নিজস্ব কী আছে এই প্রশ্নের উত্তরে ভক্তের ভূমিকাধারী কবিয়াল জানান যে ভগবানকে

© Santiniketan Sahityapath

দেবার মতো ভক্তের কাছে আছে ভক্তি এবং চোখের জল। এ দুটোই ভক্তের নিজস্ব। এই বলে ভক্তের ভূমিকা কখনো কখনো কীর্তনের সুরে গান ধরেন —

মনের বাসনা, করব উপাসনা,
নর নারায়ণ হরি।
মম মরণকালে, সম্মুখে দাঁড়ালে,
মনবাঞ্ছা যাবে পুরি।।
এই অভিলাষ পুরাও হরি।
তোমায় দেখে যেন মরতে পারি।।

ভক্ত বড় শক্ত কথা গুরু রইল বসে। গাছের ফল রইল গাছে বোঁটা পড়বে খসে।। — এই প্রশ্নের উত্তরে জানান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেন পরম বৈষ্ণব শিবঠাকুর বা দেবাদিদেব মহাদেব। তাই শিবঠাকুরের মতো ভক্ত হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ তিনি সংসারের প্রতি সমস্ত মায়া, মোহ ত্যাগ করে সর্বত্যাগী ও শ্মশানবাসী হয়েছেন পরমেশ্বর ভগবানকে পাওয়ার জন্য। গুরু রইল বসে অর্থাৎ যিনি পরমব্রহ্ম নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ তিনি বসেই আছেন অর্থাৎ অপেক্ষারত আছেন ভক্তকে ধরা দেওয়ার জন্য। গাছের ফল রইল গাছে বোঁটা পড়বে খসে — এই লাইনের ব্যাখ্যায় বলেন কৃষ্ণনাম রূপ বা রামনাম রূপ যে বৃক্ষ সেই বৃক্ষের ফল গাছেই আছে কিন্তু ফলের বোঁটা বা বৃন্তস্বরূপ যে হরিনাম; সেই তারকব্রহ্ম হরিনাম পৃথিবীতে খসে পড়েছে পৃথিবীর জীব সকলকে উদ্ধার করার জন্য। এইরূপ ব্যাখ্যা কবিয়ালদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুরাণ অধ্যয়ন করতে করতে তাঁদের মধ্যে একটি নিজস্ব ধারণা তৈরি হয় এবং ওই সমস্ত পুরাণ কথাগুলিকে নিজ অভিজ্ঞতায় সিক্ত করে মঞ্চে পরিবেশন করতে দেখা যায় কবিয়ালদের।

এভাবে যথাসাধ্য প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে পুনরায় দু একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চান ভগবানের ভূমিকাধারী কবিয়ালের কাছ থেকে। যথা — কোন্ কোন্ উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায়? বা কোন কোন পথে গেলে ভগবানের দেখা মেলে। — ভগবানের নাম বা হরিনাম করতে হয় মনে না হলে ঘরের কোণে না হলে বনে। তাহলে বিভিন্ন মন্দির, মসজিদে মাইক বাজিয়ে বা চিৎকার করে হরিনাম সংকীর্তন করে বা ভগবানের নাম বা আল্লাহতলার নাম নিয়ে আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? এরকমের দু-একটি জিজ্ঞাসা দিয়ে ভক্তের ভূমিকাধারী কবিয়াল পুনরায় বসে পড়েন। তারপর দ্বিতীয়বার মঞ্চে ওঠে ভগবানের ভূমিকাধারী কবিয়াল পাঁচালি, কবিয়ালি গল্প, টপ্পাগান ইত্যাদি গেয়ে ভক্তের ভূমিকাধারী কবিয়ালের রেখে যাওয়া প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন।

কোন্ উপায়ে বা কোন্ কোন্ ভাবে ভগবানকে পাওয়া যায় এই প্রশ্নের উত্তরে জানান পঞ্চভাবের মধ্যে যে-কোনো একটি ভাব ধরতে পারলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। সেগুলি হলো শান্তভাব, সখ্যভাব, দাস্য ভাব, বাৎসল্য ভাব ও মধুর ভাব।

শান্তভাবের পথিক যারা সনকাদি মুনি।
শান্তভাবে পেয়েছিল কৃষ্ণ গুণমণি।।
সখ্যভাবে কৃষ্ণকে পায় ওই না ফাল্গুনী।
সুগ্রিব রামকে পায় ত্রেতাযুগে জানি।।
তুমি প্রভু, আমি দাস এই করে জ্ঞান।
দাস্যভাবে হনুমান পায় রাজীবলোচন রাম।।
বাৎসল্যভাবে মা যশোদা কৃষ্ণকে পায়।
তাঁকে পুত্রস্নেহে বেঁধেছিল নন্দ-যশোদায়।
ব্রজপুরের যত গোপী তাঁরা মধুরভাব ধরে।
স্বামীরূপে পেয়েছিল দেব দামোদরে।।

© Santiniketan Sahityapath

পাঁচটি ভাবের শ্রেষ্ঠ ভাব গোপীভাব হলো।
যাকে মধুরভাব বলা যায় ভক্ত শুনে চল।।
যে কোনো একটি ভাব যদি ধরতে পারো তুমি।
অবশ্যই দেবে দেখা ভগবান গুণমণি।।

তাই হে ভক্ত, ভগবানকে পেতে গেলে জোর করে হয় না। জোড় করে পেতে হয়। অর্থাৎ জোড় শব্দে জোড়া এবং কর শব্দের অর্থ হলো হাত। তাই ভগবানকে হাতজোড় করেই পেতে হয়। তিনি আরো বলেন হে ভক্ত,

যদি পেতে চাও কিছু।
তবে কর মাথা নীচু।।

অর্থাৎ কিছু পেতে গেলে মাথা নীচু করেই পেতে হয়। শ্রদ্ধাবনত অবস্থায় ভগবানের কৃপা বেশি হয়। এই যেন পুরাণের সেই কথাকেই মনে করিয়ে দেয় — শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্। অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই একমাত্র জ্ঞানলাভ বা ভগবান লাভের অধিকারী।

চিৎকার করে বা মাইক বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন বা আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? এই প্রশ্নের উত্তরে জানান যে মানুষই হলো সৃষ্টিকর্তার একমাত্র শ্রেষ্ঠ জীব। তাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জীহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। মানুষ চোখ দিয়ে ভগবানের শ্রীরূপ দর্শণ করতে পারে। কান দিয়ে ভগবানের নাম শ্রবণ করতে পারে। পায়ে হেঁটে তীর্থক্ষেত্রে যেতে পারে। হাত দ্বারা দেবতার মন্দির মার্জন করতে পারে এবং সেবা করতে পারে। জিহ্বা বা মুখ দিয়ে ভগবানের নাম কীর্তন করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য মনুষ্যেতর জীব যেমন গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশু-পাখি এরা কথা বলতে পারে না। তাই হরিনাম সংকীর্তন করে তাদের পাপক্ষয় করার মতো কোনো উপায় নেই। তাই মানুষ যখন চিৎকার করে বা মাইক বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করে বা আযান দেয় তখন পরম করুণাময় ভগবানের বা আল্লাহতালার নাম ওই সমস্ত নিচু শ্রেণির জীবদেহের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে ফলে অনেক সময় তাদের দেহ নীচকুল থেকে মুক্তি লাভ করে উন্নত দেহপ্রাপ্তি ঘটে। তাই চিৎকার করে বা মাইক বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন বা আযান দেওয়ার রীতি। এ প্রসঙ্গে কবিয়ালদের মুখে হরিদাস ও চাঁদ কাজীর প্রসঙ্গ শোনা যায়। চাঁদ কাজী একবার হরিদাসকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে খোল করতাল নিয়ে পারিষদবর্গ সহযোগে চিৎকার চেঁচামিচি করে ভোর থেকে হরিনাম সংকীর্তন করলে অন্যান্য মানুষদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। এরূপ চিৎকার করে হরিনাম সংকীর্তন করার অর্থ কী? তখন হরিদাস ঠিক এই উত্তরই দিয়েছিলেন। উত্তর শুনে বিরক্ত হয়ে চাঁদ কাজী একজন পেয়াদাকে নিয়োগ করেন হরিদাসকে বেত্রাঘাত করার জন্য। তখন ওই পেয়াদা হরিদাসের পিঠে বেত্রাঘাত করতে করতে বাইশটি বাজার বা গ্রাম ঘুরিয়েছিল কিন্তু কেবলমাত্র হরিনামের গুনে হরিদাসের পিঠে ওই আঘাত লাগেনি। সমস্ত আঘাত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ্য করেছিলেন। এভাবেই কৃষ্ণনাম, কালীনাম, দুর্গানাম ইত্যাদি দেব-দেবী বা ভগবানের নামের মাহাত্ম্য বা গুণগান গেয়ে কবিগানের সমাপ্তি ঘটে।

তথসূত্র:

১। ‘বাংলা সাহিত্য পরিচয়’, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ২৩১-২৩২
২। ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ ৪র্থ খণ্ড, অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ.৩২
৩। ‘পূর্ববঙ্গের কবিগান’, দীনেশচন্দ্র সিংহ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৬
৪। ‘History of Bengali literature in the Nineteenth century’, Sushil Kumar De, C.U., 1919, P. 302
৫। ‘রাঢ়ের কবিওয়ালা ও কবিসঙ্গীত: ক্ষেত্র সমীক্ষা ও মূল্যায়ন’, সুবীর ঘোষ, গবেষণা গ্রন্থ, সোদগঙ্গা, ২০১৮, পৃ. ৪৯-৫০

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সুবীর ঘোষ, ‘রাঢ়ের কবিওয়ালা ও কবিসঙ্গীত: ক্ষেত্রসমীক্ষা ও মূল্যায়ন’, গবেষণা গ্রন্থ, সোদগঙ্গা, ২০১৮
২। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ‘বাংলা সাহিত্য পরিচয়’, তুলসী প্রকাশনী, ৯/৭ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১৪

© Santiniketan Sahityapath

৩। ভূদেব চৌধুরী, ‘’বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা’ ২য় পর্যায়, দে’জ পাবলিশিং, অগস্ট, ২০০৯
৪। নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ‘ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য’, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭ চৈত্র, ১৮৮০ শকাব্দ
৫। শক্তিনাথ ঝা, ‘মধ্যবঙ্গের কবিগান প্রসঙ্গ গুমানী দেওয়ান’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০২১
৬। দীপক বিশ্বাস, ‘কবিয়াল লম্বোদর চক্রবর্তী’, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১৬
৭। আবদুর রাকিব, ‘চারণকবি গুমানী দেওয়ান’, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুআরি, ২০০১
৮। স্বরোচিষ সরকার, ‘কবিগান ইতিহাস ও রূপান্তর’, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মে ২০২১
৮। যতীন সরকার, ‘বাংলাদেশের কবিগান’, আত্মজা পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৭
১০। দীনেশচন্দ্র সিংহ, ‘পূর্ববঙ্গের কবিগান’ ১ম খণ্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ:

1. Dinesh Chandra Sen, ‘History of Bengali Language and Literature’, Calcutta University, 1911
2. Sushil Kumar De, ‘History of Bengali Literature in the Nineteenth Century’, C.U. 1919

ব্যক্তি ঋণ:

১। কবিয়াল তপন চট্টোপাধ্যায়, কোশীগ্রাম, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান
২। কবিয়াল দেবাশীষ পাল, মোরদীঘি, চৌহাট্টা, বীরভূম
৩। কবিয়াল মুকুল ভট্টাচার্য, জুরানপুর, নদীয়া
৪। কবিয়াল সদানন্দ যশ, মোহনপুর, বোলপুর, বীরভূম
৫। কবিয়াল হেমন্ত ঘোষ, পূর্ণা, চৌহাট্টা, বীরভূম
৬। কবিয়াল মানিকচন্দ্র মণ্ডল, কৌড়ি, কেতুগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান
৭। কবিয়াল রসরাজ মণ্ডল, রসুনপুর, বীরভূম
৮। কবিয়াল নীলরতন পাল, বাগডোলা, ময়ূরেশ্বর, বীরভূম
৯। কবিয়াল মধুমিতা ব্যানার্জি, মিরসা, গুসকরা, পূর্ব বর্ধমান
১০। কবিয়াল কাঞ্চন মণ্ডল, তারানগর, মুর্শিদাবাদ
১১। কবিয়াল শুভাশিস ব্যানার্জি, কৌড়ি, পূর্ব বর্ধমান
১২। কবিয়াল দুলালী চিত্রকর, গনকর, মুর্শিদাবাদ
১৩। কবিয়াল সঞ্চিতা পাল, চৈতপুর, মুর্শিদাবাদ
১৪। কবিয়াল মিলি দাস, সাঁইথিয়া, বীরভূম
১৫। কবিয়াল বালীচরণ হোঁড়, মুর্শিদাবাদ
১৬। কবিয়াল তারকেশ্বর খাঁ, কাঁটাবন, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া
১৭। কবিয়াল মানিক ঘোষ, বলরামপুর, বেলট, বাঁকুড়া
১৮। কবিয়াল অম্বিকা সাহা, বৈঁচি, পূর্ব বর্ধমান
১৯। কবিয়াল তুফান বিশ্বাস, নদীয়া
২০। কবিয়াল ক্ষুদিরাম কর্মকার, নাড়িচা, পূর্ব-বর্ধমান
২১। কবিয়াল ধীরেন্দ্রনাথ বাউরি, আঁতড়া, বাঁকুড়া
২২। কবিয়াল ফকির বাড়ি, বলরামপুর, বাঁকুড়া

© Santiniketan Sahityapath